‘মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে...’

আমাদের গ্রাম এলাকার মানুষ প্রায়ই একটা কথা বলে– ‘শিখেছিলে কোথা থেকে? ঠেকেছিলাম যেখানে’। শুধু আউলিয়া-দরবেশরাই ঠেকে শেখে না, চোর-ডাকাত, মহান রাজনীতিকরাও ঠেকে শেখে। এ জন্যই মনে হয় এমন একটা প্রবাদ চালু আছে, ‘নেড়া একবারই বেলতলায় যায়’। সত্যিই কি নেড়া একবারই বেলতলায় যায়? আমি ভাবি, একবারই বেলতলায় গেলে চলে কীভাবে? হয়তো বারবারই বেলতলায় যায়, কিন্তু ভিন্নভাবে, সতর্কতার সাথে। হতে পারে কখনো মাথায় পাগড়ি পেঁচিয়ে, কখনো মাথায় কম্বল জড়িয়ে, কিংবা আরো বহুরূপে। ভিন্নভাবে বেলতলায় না গেলে বেল কুড়োবে কীভাবে? এ দুর্দিনে নেড়াকে নিয়ে এত চিন্তা না করাই ভালো; নেড়া তার অভিনব চিন্তা ও পদ্ধতি নিজের প্রয়োজনে নিজেই আবিষ্কার করে ফেলবে।

আমি ভাবছি, এদেশের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা। অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন একটা আপেক্ষিক কথা। একজনের দৃষ্টিতে যেটা অংশগ্রহণমূলক, অন্যের দৃষ্টিতে সেটা অংশগ্রহণমূলক নাও হতে পারে। বিষয়টা নিয়েও মহান রাজনীতিকদের তর্ক সামনে আসছে। ধৈর্য ধরে আমরা ‘রূপালি পর্দায়’ দেখার অপেক্ষায় থাকি। সমস্যাটা আদৌ এরকম নয়। এদেশের শতকরা নব্বই শতাংশ মানুষই মুসলমান। শুনেছি, ‘মুসলমানের এক জবান’। সেটাই এদেশের কাল হতে চলেছে। কেউ বলছে, ‘বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনেই নির্বাচন হতে হবে। আমরা সংবিধানের অতন্দ্র প্রহরী।’ অন্য পক্ষ বলছে, ‘আমরা তো তোমাদের পর পর দুবার দেখলাম, তোমাদেরকে কোনোভাবেই বিশ্বাস করা যায় না। তোমাদের কুটকৌশলের অভাব নেই। ভোট ব্যবস্থাপনায় তৃতীয় দু-চোখওয়ালা পক্ষকে আনো। নইলে যাব না, যাবই না।’ বুঝলাম, মুসলমানরা জবানের মূল্য বেশী দিচ্ছে। কিন্তু কার প্রতিজ্ঞার যৌক্তিকতা বেশি, এটা নিয়েও তো ভাবা যেতে পারে। গতকাল **৩১** নভেম্বর টিআইবি-র নির্বাহী পরিচালক বলেছেন, ‘হয়তো এ নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে... সত্যিকার অর্থে জনগণের ভোটের অধিকারের যে নির্বাচন, সেটি নিশ্চিত করা যাবে না। এ নির্বাচনের ওপর জনগণের আস্থা বা ভোটের আস্থা নিশ্চিত করা অসম্ভব হবে’। আমার মনে হয়, বিপরিতমুখী দুটো জোট যেহেতু প্রতিজ্ঞা ভাঙবে না, এ বিষয়ে প্রয়োজনে যারা এই দেশের মালিক (জনগণ) বলে বলা হয়, তাদের কাছে যাওয়া যেত। ইচ্ছে হলে গণভোটের ব্যবস্থা করা যেত। ইচ্ছে যদি থাকে সমস্যা সমাধানের, তবে অনেক পথ খোলা থাকে। প্রয়োজন অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকা এবং আত্ম-অহংবোধ একটু কমানো।

এখন এই ভোটে যাওয়া না-যাওয়ার পালা আপাতদৃষ্টিতে শেষ বলে মনে হচ্ছে। এখন ‘জোর যার মুল্লুক তার’ পর্যায়ে চলে গেছে। কেউ যেভাবেই হোক নির্বাচন করবেই। কেউবা নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধা দেবেই। উভয়ে যার যার অবস্থানে বদ্ধপরিকর। কার কি মনের উদ্দেশ্য, আমরা সাধারণ দু-চোখওয়ালা মানুষ কিন্তু বুঝি। আমরা দল-বিচ্ছিন্ন বলে, আমাদের কথায় কেউ গুরুত্ব দেয় না। আমরা (এদেশের নাগরিক হিসেবে) এদেশের মালিক– একথা কেউ মানেও না। মানলেও মুখে মানে, অন্তরে অস্বীকার করে। দীর্ঘ বছর ধরে দেখতে দেখতে এইসব ‘এক-জবানি’ মুসলমানদের কথার ওপর আমিও আস্থা হারিয়ে ফেলেছি। এরা বারবার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। এরা ’**৯১** সালে প্রধান তিনটি রাজনৈতিক জোট একটি গণতন্ত্র উত্তরণের রূপরেখা প্রণয়ন করেছিল। এরা এ রূপরেখায় স্বাক্ষর করে ‘অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ, সার্বভৌম সংসদ গঠন, জবাবদিহিমূলক নির্বাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠা, জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেছিল।’ আমার প্রশ্ন, সেসব অঙ্গীকারের কী দশা হলো? ‘কেউ কথা রাখেনি।’ জোটবদ্ধ স্বার্থবাদী মনের আকাশে অমাবশ্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার চাঁদের সবটুকু আলো ক্রমশই ঢেকে দিয়েছে। জাতিগতভাবে বাঙালি খুব আত্মবিস্মৃত। আত্মজিজ্ঞাসা এদের খুব কম। কুটবুদ্ধি ও কুটকৌশলে বাঙালি চমৎকার! ভাবতে ভীষণ অবাক লাগে! ইতিহাস তাই-ই বলে।

নেড়া যে একবারই বেলতলায় যায়, এর প্রমাণ পেলাম এবার নির্বাচনে ডামি ক্যান্ডিডেট ব্যবহারের কৌশলের কথা শুনে। ২০১৪ সালের নির্বাচনে অটো-পাশ সার্টিফিকেটের কারণে অনেক শ্রুতিকটু কথা দুর্মুখেরা বলেছিল। এবার আগে থেকেই মহান রাজনীতিকরা সে বিষয়ে সজাগ। আমাদের তো শিক্ষার ও যথার্থতার দরকার নেই, পাঁচ বছরের জন্য অটো-পাশ সার্টিফিকেট দরকার। এটা নিয়ে যতটা বুদ্ধি খাটানো যায়– ততই মঙ্গল। দেশ নিয়ে তো আমাদের কোনো ভাবনা নেই, ভাবনা ক্ষমতায় থাকা না-থাকা নিয়ে। আমার একটা ভুল ধারণা এতদিন ছিল। গবেষণা করার সময় ইকোনোমেট্রিক্স পড়তে গিয়ে মাল্টিপল রিগ্রেশন এনালাইসিস-এ ডামি ভেরিয়েবলের ব্যবহার-কৌশল শিখতে হয়েছিল। এখন দেখছি এদেশের রাজনীতিকদের রাজনীতিতেও ডামি ক্যান্ডিডেটের বিষয় অবিদিত নয়। আমার এখন শিক্ষকতা পেশা ধরেই টানাটানি শুরু হয়ে গেছে। রাজনীতিকরাও এখন ডামি ভেরিয়েবল কৌশল বোঝেন।

এদেশে রাজনীতি করতে গেলে এক চোখ ব্যবহার করতে হয়। যদিও প্রকৃতি আমাদের দুই চোখ দিয়েছে। দুই চোখ ব্যবহার করলেই আর রাজনৈতিক দলে ভেড়া যায় না। সে জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকেই রাজনীতি করার প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত রাজনীতির পথ মাড়ানো আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সাধারণত শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে লিখতে চাই। রাজনীতির এই অপচর্চা, বিকৃতভাবনা ও কর্মকাণ্ডের চলতি বাজারে মনটা সবসময় বিষিয়ে থাকে। মন থেকে শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন ভাবনা কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। তাই তো ইদানীং চলতি ঘটনা নিয়ে কিছু কিছু উদ্ভট কথা লিখি। এতে অনেক এক-চোখা দলবাজ মুখে খিস্তি কেটে গালি দেন, আবার অন্য-চোখা কোনো দলবাজ বাহবা দেন। আমার উদ্দেশ্য কিন্তু গালি খাওয়া বা বাহবা পাওয়া নয়। আমি দুচোখ ব্যবহার করে যা ভালো বুঝি, সেটাই লিখে প্রকাশ করি। কিছু একটা লিখে মনের ক্ষোভ প্রশমিত করি। বেয়াড়া মনের কারণে দেশের বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন দলের দিকে সমর্থন চলে যায়। সে বিচারে রাজনীতি-বাতিকগ্রস্ত এই দেশে আমাকে ইস্যুভিত্তিক সমর্থক বলা যায়। এজন্য কোনো নির্দিষ্ট দলে নাম লেখাতে পারি না। এছাড়া এদেশের কোনো রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রের সাথে তাদের কৃতকর্মের কোনো মিলও তো খুঁজে পাইনে। তাই এতে কখনো আমাকে কেউ খাঁটি রাজাকার, কখনো কেউ ভারতের দালাল, কখনো কেউ আমেরিকার দালাল ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করেন। আমি নীরবে সহ্য করি। একটা কথা ভাবতে খারাপ লাগে, কেউ আমাকে বাংলাদেশের দালাল বলেন না।

এদেশের যে রাজনীতি, একটু ভেবে দেখুন তো, একে কি আদৌ রাজনীতি বলা যায়? গত লেখায় লিখেছিলাম, 'রাজনীতি এদেশে এখন আর কোনো 'নীতি' নয়, নয় দেশসেবা, সমাজসেবা; সত্য হচ্ছে বর্তমান যুগে রাজনীতি একটা যৌথ প্রচেষ্টা, কৌশল, লাভজনক মিথ্যা বলা এবং টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ব্যবসা।' আবার লিখেছিলাম, 'দেশ লুটপাট ও ক্ষমতা খাটানোর একমাত্র সুযোগ হয়ে উঠেছে রাজনীতির পেশা ও রাজনৈতিক আনুগত্য। তাই নির্বাচনে জিততে এত আগ্রহ। পদপ্রার্থী হতে প্রতিটা ফরম পেতে গোপনে কত লেনদেন করতে হচ্ছে, আল্লাহ মালুম।' 'আল্লাহ মালুম'-ই বা হবেন কেন? আমরা তো কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করিনে। সমাজে যা হয় চোখে দেখি, কানে আসে। সমাজে যারা এসব করছে, তারা কেউ আমার আত্মীয়, কেউবা বন্ধু-বান্ধব, কেউ অতি পরিচিতজন। সবকিছুই দেখছি, নিয়মিত শুনছি, কখনো আইনের ফাঁকফোকর গলিয়ে সামাজিক মাধ্যম থেকে ভিডিও প্রমাণযোগে সচোক্ষে দেখছি। রাজনীতিটা হয়ে গেছে অবৈধ টাকার খেলা। রাজনীতির এ বাজার গো-হাটকেও হার মানাচ্ছে। একথা কেউ কেউ বলছেনও। গো-হাটে গরুর দাম বড় জোর লাখে গণনা করা হয়। মহামান্য রাজনীতিকদের পদপ্রার্থীতা ও আনুগত্য পণ্যের মতো কেনা-বেচা হতে শুনছি। কেনা-বেচার হাটে দরদাম ও লেনদেন আর হাজার-লাখে হচ্ছে না। কমপক্ষে কোটি– কত কোটি, কত'শ কোটি, কত হাজার কোটি এটাই জিজ্ঞাস্য। বেচা-কেনার এ হাটে কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা– এ বাচ-বিচার করার বয়স নিশ্চয়ই আমার হয়েছে। চোখ বুজে একটু ভেবে দেখুন তো, এভাবে একটা দেশ চলতে পারে কী না? এভাবে দেশ চলা উচিত কী-না? আমরা ক্রমশ কোন দিকে ধেয়ে চলেছি? আমাদের ঠিকানা কোথায়? এদেশের সাধারণ মানুষের অপরাধটা কী? কেউ কেউ এটাকে 'রাজনীতির খেলা' বলে অবিহিত করছেন। কতিপয় জ্ঞানবিধ্বস্ত-দুর্নীতিবাজ, নির্লজ্জ-স্বার্থবাদী লুটেরা রাজনীতির ছায়াতলে পুরো দেশটাকে নানা

অজুহাতে লুটে খাচ্ছে। আমরা সবাই তাদের হাতে বন্দী। তারা যা খুশি তা-ই করছে। দেশটাকে বানিয়েছে গুরুর সম্পত্তি। এ লজ্জা রাখবো কোথায়! সাধারণ মানুষ নিষ্পেষিত, উপেক্ষিত, বঞ্চিত, নিগৃহীত। নির্বাক, নিস্তব্ধ। বেঁচে থাকার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমার যেহেতু কোনো দল নেই, কৈফিয়ত চাওয়ারও কেউ নেই। রাষ্ট্রও আমাকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। রাষ্ট্র ও সরকার একাকার হয়ে গেছে। তাহলে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো? দেশে আর কী হলে আমাদের চোখ ফুটবে, চৈতন্যোদয় হবে! আমাদের অপকর্ম পুরো বিশ্বের কাছে আমাদের মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করছে, আমাদেরকে ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া, উগান্ডার মতো দেশের কাতারে ঠেলে দিচ্ছে। এদেশেরই কোনো একজন পদাসীন বিচারপতি দেশটাকে 'জাহান্নাম'-এর সাথে তুলনা করেছেন। এসব কি আমাদের জন্য শোভনীয়? স্বাধীনতা যুদ্ধের পর কি আমরা স্বপ্নেও এদেশের এই করুণ পরিণতির কথা একবারও ভেবেছিলাম? এদেশের রক্ষকরা আজ ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। পূজনীয় দেবতা শিব 'তার বিশেষ রুদ্ররূপ ধ্বংস, সংহার ও প্রলয়ের দেবতা'য় আসীন হয়েছেন।

ক্ষমতাসীন দলের ভোটের ক্যান্ডিডেটের অভাব নেই। ক্যান্ডিডেট ব্যবস্থাপনায় তারা হিমশিম খাচ্ছে। এখানেও ২০১৪ এর অভিজ্ঞতা অগ্রগণ্য বলে মনে হচ্ছে। তারা সবাই মনে করছে, নোমিনেশন পেলেই পাশ। নির্বাচনী প্রতিযোগিতা তো নেই। এমন সুযোগ কে ছাড়ে! টাকা থাকলেই রাজনীতির ব্যবসার এ সুযোগ ধরা যাচ্ছে। প্রতিযোগিতা দলীয় নোমিনেশন ও পাতানো নির্বাচন নিয়ে। এবারের নির্বাচন আনুগত্য ও আশির্বাদপ্রাপ্ত লোকদের সুখের 'বাসর ঘর' সাজানোর সাথে তুলনা করা যায়। 'মনে আশা আছে রে বন্ধু যাব তোমার ঘর, মনে আশা আছে রে ব-ন্ধু-উ।'

আমাদের গ্রামে এক গরিব দম্পতি বাস করতো। প্রায় সন্ধ্যা কিংবা রাতে ঘর থেকে মহিলার বেজায় চিৎকার করে কান্না শোনা যেত। স্বামী তাকে বেধড়ক পেটাতো। স্বামীকে কেউ কিছু বললে উত্তর দিত,'এটা আমার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, তোমরা এতে নাক গলানোর কে?' একদিন দুই গ্রামের লোক জুটেপুটে এসে চোটপাট দেখানো লোকটাকে কিছুটা উত্তমমধ্যম দিলো। তারপর বললো,'আবার যদি তোমার বাড়ি থেকে কোনো কান্নার আওয়াজ শুনি, তো তোমাকে একঘরে করবো, কিংবা পুলিশের হাতে তুলে দেবো।' এটাকে বলে সামাজিক শাসন। এদেশে তো নাগরিকের অভাব নাই। মাশাআল্লাহ আঠারো কোটি। জাতিসংঘ তো বিভিন্ন দেশে শান্তি রক্ষার্থে শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করছে। আমাদের দেশ থেকেও অসংখ্য সেনা ও পুলিশ সদস্য সে বাহিনীতে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা কি অন্তত দু-কোটি নাগরিক স্বাক্ষর করে জাতিসংঘের কাছে একটা আবেদন করতে পারি না– ব্যবসায়ী রাজনৈতিকব্যবস্থা পরিবর্তনে, রাজনৈতিক জবাবদিহি রক্ষায়, রাজনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনে, নির্বাচনকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনায় সংবিধান পরিবর্তনের জন্য সংস্থটির মধ্যস্ততায় একটা নিরপেক্ষ গণভোট করে দিতে। প্রয়োজনে এদেশের সন্তান, যারা শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত আছেন, তারাই দেশের কল্যাণে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে মোতায়েন থাকবেন। সংবিধান পরিবর্তনের কাজটা রাজনীতিকদের দিয়ে না করানোই ভালো। দেখবেন কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, দিনে দিনে সবার প্রতিই যেন আমি আস্থা হারিয়ে ফেলছি। বিষয়টা হচ্ছে, নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারে একজন দরবেশকেও ভূত বলে সন্দেহ জাগে।

(৭ ডিসেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, শিক্ষা-সেবা পরিষদ